দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ··· 2.11.1993 ···
পৃষ্ঠা ··· 12 কলাম ··· 7 ···

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক

দেশ কাল

উমর ফারুক আল হাদী

দেশের উচ্চ শিক্ষার বিস্তার লাভে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গৌরব, ঐতিহ্য ও ইতিহাসের অহংকার। দেশের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার মান উন্নয়নের গতিধারা প্রবাহিত। মুক্তজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি জাতীয় প্রয়োজনে দেশ ও জাতির কল্যাণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী গণ-আন্দোলনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আমাদের মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবময় অবদানের পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন বাকশালের বিরুদ্ধেও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারী তীব্র ঘৃণা ও প্রচণ্ড প্রতিরোধ বিক্ষোভের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। দীর্ঘ ৮২ বছর ধরে নানা প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা করে বহুবিধ সমস্যার মধ্যেও প্রতিষ্ঠানটি তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে। জন্মলগ্নের প্রথম দিকে এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করলেও ১৯৬০ সালে তৎকালীন সামরিক সরকার এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের ধারাকে ব্যাহত করার অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু এ দেশের ছাত্র-শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ আপামর মানুষ তা মেনে নেয়নি। ১৯৬০ সালের অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে এই আন্দোলন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের রূপ ধারণ করে।

আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্যের প্রতীক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বিনষ্ট হতে থাকে ১৯৭২ সালের প্রথম দিক থেকেই সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হল দখল, টেন্ডারবাজি এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে। ১৯৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত যে অপসংস্কৃতি ও অপকর্মের বীজ বপন করা হয়, তা ক্রমশ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মতো বিস্তার লাভ করে। ছাত্র রাজনীতির নামে ছাত্র হত্যা, শিক্ষকদের দলাদলি এবং লেজুড়বৃত্তির কবলে পড়ে ক্রমাগত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সুনাম ও ঐতিহ্য হারাতে থাকে। বর্তমানে এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা যেমন নেই, তেমনি যুগের চাহিদা মোতাবেক উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে। রিপোর্টে শিক্ষকদের অনৈতিক কাজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে চুক্তিভিত্তিক ক্লাস নেয়ার প্রবণতা বন্ধের কথা বলা হয়েছে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নানা প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করে তিলে তিলে গড়ে তোলা হয় আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু একটি মহল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আজ পর্যন্ত নানা কলা-কৌশল ও ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির সুনাম ক্ষুণ্ণ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করার জন্য যারা বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের অপকর্ম করেছেন তাদের চিহ্নিত করার সময় এসেছে। যারা দীর্ঘদিন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মূর্তিময় করে রাখার জন্য মরিয়া হয়েছিল, তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জাতির কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। আর এ কাজটি করতে সর্বাগ্রে দেশপ্রেমিক লেখক, সাংবাদিক ও ক্ষমতাসীন সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী দায়িত্ব পালন করতে হবে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী মূল্যবোধের চিন্তা-চেতনা এবং ধারক-বাহক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করবে এটাই জাতির প্রত্যাশা।

আজকে সময় এসেছে আমাদের নতুন প্রজন্মসহ দেশের মানুষের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে যারা প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন তাদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করার। আমাদের মনে রাখতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরেও এদেশের মুসলমান লেখকদের অবহেলা করা হয়েছে। পাঠ্যসূচিতে অনেক গুণী মুসলিম লোককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল, কায়কোবাদ, ফারুক আহমদ, জসিমউদ্দীনসহ আরো অনেকেই অবহেলিত ছিলেন এবং রয়েছেন। এখনও তাদের মূল্যায়ন সেভাবে নেই, তারা যথারীতি অনেকাংশে অবহেলিত। এছাড়া মুক্ত জ্ঞান চর্চার জন্য নিরাপদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করে সকল অপকর্ম বন্ধের জন্য যুগোপযোগী অর্জন বা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। দীর্ঘদিন থেকেই বহিরাগত অছাত্র সন্ত্রাসীদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয় জিম্মি হয়ে আছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছে। ইতোমধ্যেই আবারও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসীরা এখনও হলগুলোতে বহাল তবিয়তেই রয়েছে।

১৯২১ সালের ১ জুলাই মুসলিম হল, জগন্নাথ হল এবং ঢাকা হল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নের পূর্বে ও পরে অনেক বিরোধিতা হয়েছে। নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমাগত অগ্রসর হয়েছে এবং দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনাম ও সফলতা অর্জন করেছে। তারপরেও কিন্তু ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হবার পর কায়েদে আজম জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান নামে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় বিদগ্ধ ব্যক্তিরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের উত্তরসূরিরা আজও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বিনষ্ট করতে নানাভাবে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেই চলেছে। বিজাতীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় যারা মরিয়া হয়ে মাঠে নেমেছিল তাদের উত্তরসূরিরা এখনও কুপ্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট রয়েছে।

পেছনের কথা

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় এবং এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দাবী-দাওয়া উপেক্ষা করা হয়, তখন বাংলার মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বড়লাটের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯১২ সালের ২৭ মে মি. আর নাথানকে সভাপতি' করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এই কমিটি বঙ্গ সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার ফলে কমিটির সুপারিশকৃত কাজ আর অগ্রসর হয়নি। অবশেষে নানা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর ইম্পেরিয়েল লেজিসলেচারে ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্টের ১৮ ধারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাস হয়। জানা যায়, ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সংস্থায় মুসলমানদের বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং মুসলিম হল নামে একটি নতুন হল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি অনুষদ ছিল। ১২টি বিভাগ, তিনটি আবাসিক হল, ৬০ জন শিক্ষক এবং ৮৭৭ জন ছাত্র নিয়ে তখন যাত্রা শুরু হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করা হয় ফিলিপ হার্টগকে। ১৯০৫ সালে নতুন রাজধানী শহরের সচিবালয়ের জন্য কয়েকটি বড় ভবন নির্মিত হয়। বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালটি ছিল এসব ভবনের একটি। পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়াতে এই ভবনগুলো আর সচিবালয়ের কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়নি। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ভবনটির নীচতলা আর্টস ফ্যাকাল্টি এবং দোতলা মুসলমান ছাত্রদের হোস্টেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই হোস্টেলের নাম ছিল মুসলিম হল।

একাধিক সূত্র মতে, তখন আজকের কার্জন হলে ঢাকা কলেজের ক্লাস হতো। পরবর্তীতে এই কার্জন হলটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ভবন হিসাবে রূপ লাভ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল ঢাকার নবাব পরিবার। জানা যায়, নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর ভূমিকাও স্মরণীয়। ১৯২১ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্যও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী লিখিত প্রস্তাব পেশ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের কারণে নতুন প্রদেশ ও প্রাদেশিক সরকার গঠিত হবার পর এই অঞ্চলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে জোয়ার এসেছিল তার ধারাবাহিকতার অগ্রগতিতে ঢাকায় একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী তুলেছিলেন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। কিন্তু পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গ রদ হবার কারণে এই সম্ভাবনা অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু ১৯১১ সালের ১৯ আগস্ট ঢাকার কার্জন হলে ল্যান্সলট হেয়ারের বিদায় এবং চার্লস বেইলীর শুভাগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা সভার পৃথক দু'টি মানপত্রে নবাব সলিমুল্লাহ ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী পুনরায় ঢাকাতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। পরবর্তীতে ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় অবস্থানকালে সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীসহ ১৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে এ অঞ্চলের মুসলমানদের যে সমূহ ক্ষতি হয়, তা তুলে ধরেন। এই সময়ে স্যার সলিমুল্লাহ ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীসহ দলের সদস্যরা ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো দাবী তুললে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে ২৭ মে ১৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী এই কমিটির সদস্য ছিলেন। এই কমিটিই 'নাথান কমিটি' নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এই কমিটির অধীনে আরও ২৫টি সাব কমিটি গঠিত হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী ৬টি বিভাগেরই সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে ১৯১৭ সালের ৭ মার্চ ইম্পেরিয়াল কাউন্সিলে এ বিষয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী পুনরায় উত্থাপন করেন এবং এ প্রেক্ষিতেই ১৯২০ সালের ১৮ মার্চ ভারতীয় আইনসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল এ্যাক্ট পরিণত হয় এবং ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ তা গভর্নর জেনারেল অনুমোদন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে মুসলমানদের অগ্রাধিকার দিলেও ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্তই এ অঞ্চলের জ্ঞানী-গুণী মুসলমান ব্যক্তিবর্গ ও মুসলিম সমাজ অবহেলিত ছিলেন। পাকিস্তান শাসনামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মনোগ্রাম পরিবর্তন করা হয় এবং তা ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। মনোগ্রামে হিন্দু চাঁদের স্থলে মুসলমান চাঁদ স্থাপিত হয় আর স্বস্তিকার স্থলে 'রাব্বী জিদনী ইলমা' সম্বলিত আল কুরআনের প্রতীক মনোগ্রামে স্থান পেয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর আবারও মনোগ্রাম দুই দফায় পরিবর্তন করা হল। ১৯৭২ সালে তৈরী মনোগ্রামে পবিত্র আল কুরআনের বাণী রাব্বী জিদনী এলমা সম্বলিত আল কুরআনের প্রতীক সরিয়ে দেয়া হলো। আল কুরআনের এতবড় অবমাননা পৃথিবীর অন্য কোন মুসলিম দেশে হয়েছে বলে জানা নেই। কিন্তু এ বিষয়ে আজও কোন প্রতিকারের উদ্যোগ নেই। শুধু তাই নয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের স্থলে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে সলিমুল্লাহ হল করা হল। জিন্নাহ হলের নাম পরিবর্তন করে সূর্যসেন হল করা হল। কিন্তু আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুলের নামে কোন হল আজ পর্যন্ত করা হয়নি। জানা যায়, কাজী নজরুল ইসলামকে বরাবরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবহেলা করে আসছে। পাঠ্যসূচিতে নজরুল বরাবরই ছিলেন অবহেলিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে দেশী-বিদেশী নানামুখী চক্রান্ত চলতে থাকে। আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গলঘট, রাখী বন্ধন, সিঁদুর ও মূর্তিমানের সংস্কৃতি চালু করা হয়েছিল। জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরেই ইসলামী মূল্যবোধকে নির্বাসিত করার নানা অপচেষ্টা এখনও অব্যাহত রয়েছে।